



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 145 - 151

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাস : কাটা দেশে অন্ধরের খোঁজে

ড. অর্ণব সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা

Email ID: arnabrai07@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Bengal-partition, 1947, Refugee, Exodus, Homelessness, Struggle, Riot-victims, Sicking Shelters.

Abstract

Partition of the undivided Bengal in 1947 brought a catastrophic disaster in the lives of a huge number of Bengali middle-class and poor population, who were neither a part of the colonial British rulers-Indian upper-class politicians' selfish strategy-nexus to secure power, privilege, hegemony and business facilities of only their own interest, nor it served their regular life-necessities. On contrary it totally destroyed their everyday life-fabric and an exodus of homeless refugees were compelled to come to West Bengal leaving their all belongings left in East-Pakistan. It devastated lakhs of ordinary peoples' life and they had to find shelter here in the Rail stations, camps, wastelands and other places. They suffered a lot, built colonies and had to fight an uneven battle to survive in a completely hostile, unknown situation. Bengali novels and short stories portrayed a vivid picture of their struggles, obstacles and united fight against all atrocities. Communal tensions were pictured by many writers who were eye-witnesses of riots. simultaneously a big number of incidents also registered where both the communities of Hindu and Muslims were able to maintain communal harmony and century-long bondage among them. In this small article a few number of Bengali novels and short stories have been discussed where those uprooted peoples' day-to-day struggles, their waves of life, their pathos and ecstasy are portrayed in subtle creative ways. The approach of this article is to discuss the mixed pictures of the deluge of that time-frame and to reconsider the most horrific tragedy of Bengali society, which is, perhaps one of the darkest historical human-calamities happened in the whole South-East Asian post-second world war-spectrum. It tried to grip the different shades of those unfortunate people who lost their known ancestral life and gone through an ordeal of cruel time-frame. Bengali partition-literature is too rich and this article is a little effort to sketch an outline of that vast archive.

Discussion

“পরম পূজনীয় হেডমাস্টার মহাশয়,

আপনার সন্তানদের আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার সালাম গ্রহণ করিবেন। স্কুল খোলার পর আজ ১০ দিন অতিবাহিত হইতে চলিল, আমরা আপনার পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এখনও আপনাকে না পাইয়া আজ আপনাকে দু'কলম লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভুলত্রুটি মার্জনা করিবেন ... শুনলাম সাহাপুরের গুন্ডা কাসেম আপনার অনুপস্থিতিতে খিলপাড়া আসিয়া আপনার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে— সেজন্য খিলপাড়া আসিতে আপনি ইতস্তত করিতেছেন। সে দস্যু কবে এখানে আসিয়াছে তাহা আমরা কেহ জানি নাই। আমরা ছাত্রেরা যদি কেহ তথ্য থাকিতাম তবে সে খিলপাড়া উঠিতে সাহস করিত না। ... “আপনারা দেশের নতুন নেতা সাজিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া আজ নোয়াখালির নামের উপর কলঙ্কলেপন করিয়াছেন” - এর থেকে কঠোর ভাষায় তাকে গালি দিতেও এখানকার অধিবাসী পিছপা হয় নাই ... আপনি একথা বিশ্বাস করিবেন যে, এদেশের মুসলমান এখনও আপনাকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করে। আপনার উপকারের কথা তারা ভুলতে পারবে না। আপনি খিলপাড়া স্কুলের উচ্চতম আসনে আসীন থাকিবেন— এই আশায়ই এখনও এ-স্কুলে ছাত্রসংখ্যা সাড়ে তিনশত আছে ... আমরা খোদার নামে শপথ করে বলতে পারি যে, আপনার নিরাপত্তার জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ব্যয়িত হইবে। যে পিতার তিনশত পুত্র, শত্রুকে তার ভয় কিসের—যদি খোদা রাজি থাকে ... আপনার নিকট আমাদের সকরণ আবেদন এই যে, আপনি পত্রপাঠমাত্র এক মুহূর্তও দেরি না করিয়া খিলপাড়া রওয়ানা হইবেন’ — আলী আকবর। খিলপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রদের পক্ষে’।”^১

নোয়াখালি দাঙ্গার পর পূর্ববঙ্গের খিলপাড়া গ্রাম ছেড়ে চলে কলকাতায় চলে এসেছিলেন প্রধান শিক্ষক নলিনীরঞ্জন মিত্র। তিনি ছিলেন ‘হিন্দু মহাসভা’র সদস্য, যে রাজনৈতিক সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগের পক্ষে ছিল। কিন্তু তাঁর স্কুলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছাত্রেরা প্রিয় হেডমাস্টারমশাইকে ছাড়তে চায়নি। তারা তাঁকে লিখেছিল এই চিঠি। মাত্র কয়েকমাসের সিদ্ধান্তে যে র‍্যাডক্লিফ সাহেব গোটা বাংলাকে দু’টুকরো করে দিলেন, তাতে দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মহলের কোন কোন আর্থিক সুবিধার বন্দোবস্ত হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিহাসের প্রামাণ্য নথি কম নেই। অথচ রাতারাতি দেশ হারিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবাংলায় বাঙালি হিন্দুর যে বিপুল ‘এক্সোডাস’ ঘটেছিল, দেড়হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে তার সমতুল্য মর্মভূদ আখ্যান আর আছে কিনা সন্দেহ। যাদের উচ্চতম অর্থনৈতিক সংগতি এবং সামাজিক যোগাযোগের পুঁজি ছিল, তারা হয়তো সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি, কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ বাঙালি হিন্দুর জীবনে সেদিন নেমে এসেছিল এক দুর্বিষহ অভিশাপ, তার কাহিনি বাংলা সাহিত্যে যতোটা গুরুত্ব দিয়ে আঁকা দরকার ছিল, ততোটা কি আদৌ আঁকা হয়েছে? সম্ভবত নয়। কারণ, দৈব দুর্বিষ্যতের মতো এক টালমাটাল ঝড় উৎখাত করে দিল এক বিপুল জনগোষ্ঠীকে, তাদের স্থায়ী অতীত আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে কাঁটাতারের এক অলঙ্ঘ্য হাইফেন জুড়ে গিয়েছিল, যে ছেদচিহ্ন তাদের গোটা জীবনকেই অনিশ্চিত করে দিয়েছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘গণনায়ক’ গল্পটির কথা মনে পড়বে আমাদের -

“অছিমদী জিজ্ঞাসা করে, ‘মীরপুর কোথায় পড়ল হজুর?’

‘মীরপুর কোন জেলায়?’

কাঁদো কাঁদো হয়ে অছিমদী বলে, ‘হরিশ্চন্দ্রপুর থানা।’

সাওজী বলে দেয়— “ও হল মালদা জেলা।”

‘মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে’

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদী এতো অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে আর কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না। বজরগাঁর পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান আছে। সাওজী উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজীর সম্মুখে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন— ‘আর বজরগাঁ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা?’

‘বাবাজী, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তা করবেন না। রামজীর আশীর্বাদে ওটা হিন্দুস্তানেই পড়েছে।

‘পড়বে না? বাপ-পিতাম’র আমল থেকে আমরা রয়েছে বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হল? জলেশ্বরীর এলাকা, মহাকালের রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে? বড়লাট ভারি সমজদার লোক। নারায়ণ! নারায়ণ!’ ”^২

প্রবল অনিশ্চয়তা, উৎকর্ষা আর কম্পিতবক্ষে অতিসাধারণ গড়পরতা মানুষ যখন নিজেদের ভাগ্যপরীক্ষা করছে, তখন সুতোয় নাচানো পুতুলের মতো ইচ্ছে মতো তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে যারা তারা রয়ে গিয়েছে পর্দার আড়ালে। অথবা ততোটা আড়ালেও নয়। ঐতিহাসিক তপনমোহন রায়চৌধুরীর মতো পূর্ববঙ্গের জমিদার-পরিবারের সন্তানও তাঁর ‘রোমন্থন অথবা ভীমরতিগ্রস্তর পরচরিত চর্চা’য় সেই দুঃসহ স্মৃতির উল্লেখ করছেন—

“আমরা বুঝলাম পূর্বপুরুষের ভিটে এবার ছাড়তে হবে। ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হবে সেখানে মুসলমান ভিন্ন অন্যসব সম্প্রদায়ের নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত হবেন...আমরা শুনেছিলাম সে রাষ্ট্রে দাঙ্গা হবে। বাড়িতে একটিমাত্র বন্দুক, সত্যি দাঙ্গা হলে ওই একটি অস্ত্র কি কাজে লাগত জানি না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বাবা সারারাত বসে থাকলেন। ১৯২০ সালে মানুষটি কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।”^৩

একটা স্থিতিবস্থা ক্ষয়ে আসছিল সেই ১৯২৬-২৭ থেকেই, যখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং নির্বাচনী পরিসরে ধর্মীয় আত্মপরিচিতির জায়গাটা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সেই পারস্পরিক ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং ‘অপরাধকরণ’ যেভাবে দ্রুত আগুনের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগল, বিশেষত ১৯৫০-এ পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা ও হিন্দুনিধনের পর, তা অনেকেই আঁচ করতে পারেননি। নীলিমা দত্ত তাঁর একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা ‘উদ্বাস্ত কলোনি’তে লিখেছেন দমদম যশোর রোডের দুই দিকে একের পর এক পুরোনো পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ির দখল নিচ্ছেন লড়াকু হিন্দু উদ্বাস্ত মানুষ। মানুষের জীবনের বাস্তব পরিবর্তন এবং বেগতিক অসহায়তা কতোদূর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে জানা যায় তাঁর কলমে—

“সময়টা বাংলা বছরের শেষাংশে। দারুণ গরমের মধ্যে রোজ সকালে শ্বশুরমশাই ও মা, ছেলেরা কেউ কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন। হাতে থাকত বুড়ি, শাবল, দুরমুশ করার যন্ত্র, আরও টুকিটাকি। অবাধ হয়ে চেয়ে থাকতাম ওই মজুর আর মজুরনিদের দিকে। কে বলবে, এঁদের একজন চাঁদপুরের কামরাঙা কাছারির নায়েব, আর অন্যজন চট্টগ্রাম করের হাটের জমিদারকন্যা! পরিস্থিতি কতো অনায়াসে এঁদের পালটে দিয়েছে।”^৪

মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননা যে প্রত্যক্ষ ও অন্তর্নিহিত রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে ওপার বাংলা থেকে মার খেয়ে চলে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষদের মনে, তা কিন্তু ততোটা বাস্তব নিষ্ঠুরতায় ধরা পড়েনি বাংলা পার্টিশন-সাহিত্যে। বরং, বহু বিখ্যাত লেখকের দেশভাগের গল্প-উপন্যাসেই একধরনের পারস্পরিক সহানুভূতি, হৃদয়বত্তা, দরদী আবেগ দেখানোর চেষ্টা কাজ করে গেছে লেখকদের কলমে। বড়ো হয়ে উঠেছে একধরনের আদর্শায়নের ঝোঁক। রমেশচন্দ্র সেনের লেখা ‘পথের কাঁটা’ গল্পে দেখা যায়, পূর্ব থেকে পশ্চিম আর পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে থাকা দুটো বিপরীত মিছিলের মানুষদের কথা, যারা নিজেদের যৎসামান্য সঞ্চয়টুকু পাথেয় করে দেশান্তরী হচ্ছে। অথচ একদল যখন অপর দলের দিকে তাকায়— ‘দু’দলের দৃষ্টিই শান্ত। তাতে হিংসা নাই, তাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করল কে? কারা?’ সমরেশ বসুর সাড়া জাগানো গল্প ‘আদাব’-এও নিম্নবর্ণের দুই ধর্মের দুই ব্যক্তি, একজন সুতাকলের মজুর আরেকজন নৌকোর মাঝি, বিড়ির টানে একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ইজ্জৎ’ গল্পে নমঃশূদ্রের পুরোহিত, ডাকাতে কালীর পূজক জগন্নাথ সরকার আর ফকিরের মাজারের ধলা মস্তাই, এই দুই ধর্মের মানুষ মিলে যায়— ‘শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত’। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প ‘পালঙ্ক’-তে রাজমোহন মুসলমানের কাছে বেচে দেওয়া নিজের পালঙ্কে শুয়ে থাকতে দেখেন মকবুলের পুত্রকন্যাকে, তাদের মধ্যেই খুঁজে পান নিজের ‘রাধাগোবিন্দ’কে।^৫

এই আদর্শায়নের দু-তিনটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। প্রথমটি হল পূর্ববঙ্গের যে বিরাট অংশের হিন্দুকে সেদিন নারকীয় দুর্ভোগের শিকার হিসেবে উৎখাত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল, কলকাতায় আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, পূর্ববঙ্গের জমির আয় রয়েছে অথবা উচ্চপদের চাকরিবাকরি রয়েছে, তাই এপার বাংলাতে এসেও খুব বড়ো সমস্যায় পড়তে হয়নি, এরকম প্রিভিলেজড ভদ্রবিত্ত অংশটির কাছে দেশভাগের ‘ট্রমা’ আদৌ ধরাই পড়েনি। আখতারউজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’য় ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ বলেন— “মোসলমান হল হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।” অর্থাৎ যে সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে ভদ্রলোক উচ্চবর্ণীয় বাঙালি হিন্দু ১৯৪৭-এর দেশভাগকে সমর্থন জানিয়েছিল, তার প্রধান কারণটাই লুকিয়ে ছিল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং ব্যাপক পিছিয়ে-থাকা মুসলমানের প্রতি তাদের চরম অসংবেদনশীলতার ভিতরে। আর, মূলধারার বেশিরভাগ লেখকরাই এই অংশ থেকেই এসেছেন। তাঁরা ওই ‘ট্রমা’র সঠিক চিত্রায়ন ঘটাতে চাননি বা পারেননি। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা। ভারত-ছাড়ো আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা, পাকিস্তান প্রস্তাবকে ‘জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ’-এর অধিকার হিসেবে সমর্থন করা, রণদিভের ভ্রান্ত ‘জনযুদ্ধ লাইন’ এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিভেদকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণের অভাবে পার্টি সেদিন দোদুল্যমান অবস্থায় থেকেছে। একই সঙ্গে গোটা ‘প্রগতি’ লেখক শিবির-সহ বাংলার মেইনস্ট্রিম সাহিত্যস্রষ্টারা দেশভাগজনিত বীভৎসতাকে একধরনের ‘আদর্শায়িত’ ছাঁচে ধরতে চেয়েছেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ততোটা কঠোর হননি তাঁরা, যতোটা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, ফলত, যন্ত্রণার অণুপুঞ্জ স্তরে বহুক্ষেত্রেই পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। তৃতীয়ত, লেখক দেবশ রায় যেমন বলেছেন, একধরনের ‘নৈতিকতা’র বোধ কাজ করেছে লেখকদের মধ্যে। ‘রক্তমণির হারে’ সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন— ‘মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের কোনো ফর্মেরই কোনো জন্মস্থান নেই। এমন হতেই পারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গায় সে নৈতিকতা যতোটা সহজ বোধের নাগালে ছিল, দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত দেশভাগে ততোটা নাগালে ছিল না। এমনও হতে পারে, ওই বাস্তবতাকে আঁকাড়া গল্প উপন্যাসে আনলে সেই নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করা হত, কারণ, দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময়...মানুষকে, প্রকৃতিকে, জীবনযাপনকে ও ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল’।^৬

ওপার বাংলা থেকে উদ্ধাস্ত হয়ে এপারে আসা চালচুলোহীন মানুষের লড়াই এবং আশ্রয়-অন্বেষণের মরীয়া প্রয়াস ধরা পড়েছে অমরেন্দ্র ঘোষের লেখা ‘বেআইনি জনতা’ উপন্যাসে। মাথা গোঁজার জন্য এই ছিন্নমূল জনতা এক রায়বাহাদুরের পরিত্যক্ত জমির দখল নেয়। গোটা উপন্যাসে লেখক বস্তিজীবনের এক অনুপুঞ্জ ছবি এঁকেছেন। আমিরণ, মিস্ত্রি সাহেব, নন্দী, মধুওয়ালী, মেনকা, বাঁদি কুলসুম, বেওয়ারিশ ছেলে নিতাই ও গৌর, শের সাহেব প্রভৃতি কোনওরকমে দিন-কাটানো মানুষ এসে ভিড়েছে সেই বস্তিতে। কিন্তু রায়বাহাদুরের গুন্ডাদের আক্রমণে সেই উদ্ধাস্ত কলোনি থেকেও সরে যেতে হল তাদের একদিন। কুলসুম আর আমিরণ বাধ্য হল পতিতাপল্লিতে নাম লেখাতে। কিন্তু লেখক এই পরাজয়ের আখ্যানেই গল্প শেষ করেননি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই ঠাইনাড়া লোকগুলো এক দীর্ঘ সম্মুখযুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। সদ্য-স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সাধারণ এপার বাংলার মানুষের কাছে এই সর্বহারা মানুষেরা সম্পূর্ণ অপাঙ্ক্তেয়। তাদের আইনি অধিকার নেই। তাই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের খোঁজে তাদের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়। উপন্যাসের সবচেয়ে স্পর্শকাতর চরিত্র আমিরণ নামের নারীটি। নন্দী মারা গেছে, তার মৃতদেহ সংকার করতে হবে। আমিরণের যেটুকু সঞ্চয়, তা দিয়ে সেই কাজ করা অসম্ভব। পোশাক বদলে বেরিয়ে যায় সে। কয়েকঘণ্টা বাদে ফেরত আসে। তার চোখজোড়া তখন বসে গেছে। শাড়ি হয়েছে শিথিল। গোটা শরীরে-মুখে পরিশ্রমের ছাপ। সংকারের টাকা হিন্দু বাসিন্দাদের হাতে তুলে দিয়ে এই মুসলিম নারী বলে ওঠে— “হুঁশিয়ার যেন অযতন না হয়। নন্দী আমার আইবুড়ো বাপ”। আমিরণের চরিত্রের এই দিকটি গোটা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিক্‌দর্শন করায়। হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের আবহে যে দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি, সেখানে এই নীচুতলার মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে অমরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাসে। সে একটু একটু করে খারাপ পথে তলিয়ে যেতে বসেছে। দুর্যোগ ঝাপটা মেরেছে তাকে। তবু সে জানে— “খোদা পয়দা করেনি এ দুনিয়া। মানুষই যেন করেছে মানুষের সর্বনাশ— বাইরে পীর পয়গম্বর, ভিতরে শয়তান”। গভীর রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার

মনে পড়ে ফেলে আসা কাটা-দেশের সেইসব মানুষের কথা— “ভাঙতে ভাঙতে আমিরণ যেখানেই এসে দাঁড়াত, সমাজ তার গায়ে যতোই পঙ্ক নিক্ষেপ করুক, আসলে সে এক মাটির ঘরের মেয়ে তো? মরমী দরদী মন তার শত উপবাসের আঁচেও দন্ধে পুড়ে যায়নি।” এই আমিরণকে ঘিরেই আরও একাধিক মুখ— কুলসম, কুড়ি, অন্ধ আর খঞ্জ দম্পতি, আসন্নপ্রসবা যুঁই, বেওয়ারিশ দুই ছেলে গৌর-নিতাই, কড়া ইস্পাতের মতো ধারালো মির্জা, স্নেহের কাঙাল নন্দী এবং আরও বহু চরিত্র। রয়েছে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি মির্জা। ওপার বাংলার দেহাতী কিষণ, রুগ্ন, শীর্ণ, দীর্ঘদেহী একটি মানুষ। অন্তর থেকেই সে যেন ঘৃণা করে এই পরিবর্তমান দুনিয়া। সে থুথু ফেলে বারবার। অনির্দিষ্ট বাসস্থানে দাঁড়িয়ে একপাল মানুষ শহরের সর্বত্র পথচারী কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মির্জা যেন তাদের পিতামহ। সে ডেরা বাঁধতে পারে না। শিক্ষা করতেও অক্ষম। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণাও নেই। তাকে দেখে উন্মাদ বলেই মনে হয়। বিপুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে যে অনমনীয় মনোভাব অর্জন করেছে, তা দিয়ে এই পাশবিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চাইছে সে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এর অন্তিম সংঘর্ষের দিক। রায় সাহেবের লোকেরা উচ্ছেদ করতে এগিয়ে এলে উদ্বাস্তুদের দলটি এগোতে থাকে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে। নেতৃত্ব থাকে হাওয়াকলের বুড়ো মিস্ত্রি। অমরেন্দ্র এই উপন্যাসের অন্তিমে বলেছেন—

“এ পরাজিত সৈনিকের খাঁটি ত্যাগ নয়। বিশেষ আবহাওয়ায় দুর্যোগ মাত্র বিশেষ ব্যবস্থা। এই ময়দানেই যে সমগ্র জনতার আজ-পরাজয় একেবারে কৃত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তা তো নয়। আরও আছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাই দূরদর্শী নেতা বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রতিটি সৈনিকের মূল্যবান প্রাণ।”^৭

কিন্তু দেশভাগ ও দাঙ্গাপ্রসূত হিংসা, বিশেষত মেয়েদের বিরুদ্ধে যে হিংসা সেদিন ঘটেছিল, গোটা দুনিয়ার সমস্ত সাম্প্রদায়িক হিংসাতেই মেয়েদের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা ঘটে, তার সুদৃষ্টি উচ্চারণও বাংলা সাহিত্যেই হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে সর্বস্ব হারিয়ে এপারে চলে আসা হিন্দু বাঙালিকে এপারের হিন্দু বাঙালিই যে আপদ এবং বোঝা বলে ভাবছে এরকম ছবিও রয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘পরিচিতি’ গল্পে গুল্টনের মায়ের মুখে শোনা যায় এরকম উক্তি— “ওই বজ্জাত পাকিস্তানি মাগী, চাল নেই, চুলো নেই, কোথায় বাড়ি-ঘর ঠিকানা নেই। এখানে এসে লম্বা লম্বা ঝাড়ে, ওর নাকি তিনশ বিঘা ক্ষেত ছিল, ছাই! গভর্নমেন্টকে ঠিকিয়ে খাচ্ছে।” জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসের ভূমিকা ‘আমার কথা’-য় বলেছেন— “মহাকবি হলেও পুরুষ, কাপুরুষের নারীদেহের ওপর সেই অত্যাচারের বর্বর লাঞ্ছনার কাহিনী লিখতে পারেন না। লজ্জা ধিকারে তাঁর লেখনী অভিভূত মূক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই পুরুষকবি সেকথা লেখেননি ... কাপুরুষ তো ইতিহাস লেখে না। নারী কবি, মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান লজ্জা মর্যাদা সম্ব্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।” অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘নির্বাস’ উপন্যাসে আমরা পাই সেই বীভৎসতার ছবি। দেশভাগের বারো বছর পর বিমলা স্মৃতির ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতাজনিত ‘ট্রমা’য়। ১৯৪২ সালে উদ্বাস্তু হয়ে হাটপথে সে এসেছে রেঙ্গুন থেকে পূর্ববঙ্গের ব্রজযোগিনী অন্দি। পথে বিমলার দিদি মারা যায়। দেশভাগের পর ফের তাকে ঘরছাড়া হয়ে নামতে হয় পথে। এইসময়েই ভৈরবে ট্রেনের কামরায় ধর্ষিতা হয় বিমলা। চোখের সামনে সে আরও বহু নারীকে ধর্ষিতা হতে দেখে। বাস্তবহারা মানুষের ভয়, আতঙ্ক, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বিমলার স্মৃতিতে ফিরে আসে –

“কোথা থেকে কি যেন হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল নিস্তব্ধ ঝাঁঝ ডাকা একটা মাঠের মধ্যে। কোথায় এলাম বুঝবার উপায় ছিলো না। গাড়ির হলুদ আলোয় রেলপথের ধারের ঝোপঝাড়কে গভীর করে দেখাচ্ছিল। তারপর কোলাহল আর আতর্জনাদ শুরু হলো। এঞ্জিনের দিক থেকে, গার্ডের গাড়ির দিক থেকে। অনেক কণ্ঠের উল্লাস রব, অনেক কণ্ঠের আতর্জনাদ। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সে পাশের ফাস্ট ক্লাশ কামরায় সাহেবদের লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভালো করে কিছু দেখবার আগেই বাইরের হেঁচকা টানে তাদের কামরার দরজাটা খুলে গেলো। বাইরের সেই উল্লাস রব আর আতর্জনাদ এবার বুকের পাশে ... তার শাড়িখানা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। মচকানো পাটা সে মাটিতে পাততে পারলো না। আবার এক স্থাপদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে পড়ে গেলো। চারিদিকে স্থাপদের চোখ— টর্চগুলো জ্বলছে। দুড়দাড় করে তারা এমাথা থেকে ওমাথা ছুটছে। কে একজন তার সেই পা

মাড়িয়ে দিয়ে গেলো। এর একজনের বুটের ধাক্কা লাগলো তার মুখে। তারপরে দু-তিনজন এসে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো তাকে ঘিরে। কয়েকজোড়া হাত তাকে ঘিরে। কয়েক জোড়া হাত তার পা হাত পা মাথা চেপে ধরেছিলো ... জ্ঞান হওয়ার মতো একটা ভাব হয়েছিলো, বোধহয় তখন শেষ রাত। আকাশে দু-একটা তারা। কোমর থেকে পা কি ট্রেনে কাটা গেছে? ... বাস্তবহারাাদের মধ্যেও চমকপ্রদ বাস্তবহারা সে। শোবার মাদুরটাও নেই, পরনের খান ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। মরণচাঁদের দলের যে কেউ সম্বলের দিক দিয়ে তার চাইতে ধনী। মনে হয়েছিল তার বারবার, সে আর মানুষ নেই ভৈরবের ঘটনার পর। সেই কুকুরদের কামড়ে সে এখন কুকুর। একটি নারীর প্রেত, প্রতিহিংসা নেবার মনোভাবই যার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে।”^৮

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের এরকম ভয়ানক হিংসাত্মক ছবি খুব কমই রয়েছে, যা অমিয়ভূষণ ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর এই অসামান্য উপন্যাসে।

তবে দেশভাগের পর এপার বাংলায় এসে উদ্বাস্ত নারীপুরুষের লড়াইয়ের ছবিও ফুটেছে অনেক গল্প-উপন্যাসেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অর্জুন’ অথবা ‘পূর্ব-পশ্চিম’ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘নিশ্চিন্তিপুত্রের মানুষ’-ও তেমনই এক আখ্যান, যেখানে ছিন্নমূল মানুষের দিক্‌হারা আশ্রয় খোঁজার অনিশ্চিত লড়াইয়ের এক মরমী আখ্যান ফুটে ওঠে। এই উপন্যাস শুরুই হচ্ছে তিন ইন্টারের উনুনে আবর্জনা জ্বালিয়ে ভাত ফুটিয়ে খাবার মর্মান্তিক ছবিতে। সরকারি চিড়ে-গুড়ের ডোলপ্রার্থী মানুষ, প্ল্যাটফর্মের একচিলতে জায়গায় চট কিংবা মাদুর বিছিয়ে বসে থাকা মানুষের টাইমকলের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা, প্রাতঃকৃত্যের জন্য সকাল থেকে লাইন দেবার বাস্তব ছবি এর শুরুতেই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্য আরও বহু লেখার মতোই অধঃপতিত বাস্তবের কঠোরতম চেহারা এই উপন্যাসে ফুটে ওঠে। সদ্যযুবতী সন্ধ্যা লজ্জা নিবারণের জন্য টিকিট-কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে হাত পেতে পয়সা নেয়। মুক্তার সদ্যপ্রস্ফুটিত যৌবনকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চলতে থাকে। তার সঙ্গে ফেরিওয়ালা বলাইয়ের সংযোগ গড়ে ওঠে। এই বলাই দাসের কোনও পূর্ব-ইতিহাস নেই অথচ সেও দেশহারা এক ছিন্নমূল মানুষ। দুর্গন্ধে-ভরা ঐন্দোগলিতে রাখাচরণের চোলাই বেচার খুপরিতে কোনওক্রমে রাতটুকু কাটায় সে। বিনাপয়সার ডালমুট খাইয়ে মুক্তার আস্থা অর্জন করতে চায়। অথচ মুক্তা তাকে বলে— “আমি মাইয়ামানুষ, কুচরিত্রের পুরুষের চউখ দেইখ্যা সব বুঝি, ফেরিওলা”। একইসঙ্গে মুক্তাও চায় কিছুটা রমণীসুলভ স্বাভাবিক লাস্যে বলাইকে মুগ্ধ করতে। আবার এই বলাইই মুক্তার ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে লম্পট কুমারেশ দত্তের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে। নারীমাংসলোভী কুমারেশ নৌকায় ওঠে মুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে। মাঝির সঙ্গে গোপন যোগসাজশে সে নিজের রুগ্মা স্ত্রী প্রভাকে নৌকা থেকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেয়। স্ত্রীকে খুন করে মুক্তাকে ভোগ করার বাসনা তার। মুক্তা পালায়। অবিশ্বাস্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ফের তার সঙ্গে দেখা হয় বলাইয়ের। তাদের জীবনে আসে দুই ভাই রতি আর মতি। এই চারজনের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের টানাপোড়েনে আখ্যান এগোয়। মুক্তাকে ঘিরে দুই ভাইয়ের টানাপোড়েনের মধ্যেই এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত ঘনিয়ে ওঠে। রতি মুক্তা সম্পর্কে বলে ওঠে— “কাল সুখ্যি ওঠার আগে ওটাকে তাড়িয়ে দেব”। জবাবে মতি বলে ওঠে— “তাই দাও, তাই দিও — ছি ছি, তুমি জগৎ কর্মকারের নাতি, মনোহর কর্মকারের ছেলে— একটা বাস্তবহারা মেয়ে, চাল নেই, চুলো নেই, বাপ-মার পরিচয় নেই — এইরকম একটা মেয়ে যদি...”। পুরুষের অক্ষম যৌন-অনিশ্চয়তার নিরিখে উদ্বাস্ত মেয়েকে এই প্রত্যাখ্যানের শেষে আবার ফিরে আসে বলাই। সাবি যখন বলে— “হুঁ, নিশ্চিন্তিপুত্রের মানুষ— আমরা তো জানি শিয়ালদার ফেরিওয়ালা— কিষির কাজ শিখল কবে!” খুরপি হাতে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলাই তার দেশহারা অতীতের শিকড়ে পৌঁছে যায়—

“আমার বাবার মতন অমন চমৎকার পাটশ্বেত নিড়াতে কেউ জানে নাকি— সেই বাপের বেটা আমি।”^৯

একইরকম রক্তমাংসময় দেশভাগের জীবন ফুটে উঠেছে প্রফুল্ল রায়ের একাধিক গল্পে— ‘মাঝি’, ‘চর’, ‘রাজা যায় রাজা আসে’, ‘স্বপ্নের ট্রেন’, ‘শিকড়’, ‘অলীক নৌকার যাত্রী’ — এরকম বহু গল্পে। ‘কেয়াপাতার নৌকা’ ট্রিলজিও বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন। বিশেষত, ‘স্বপ্নের ট্রেন’ গল্পটি এই দেশভাগজনিত ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতার এক অবিস্মরণীয় ছবিকে ধরে রাখে। ছিন্নমূল অশোক প্রায়ই স্বপ্নে একটি ট্রেনকে দেখতে পেত, যে ট্রেনে চেপে সে আজ নর্থ ক্যালকাটার অন্ধ

গলিঘুঁজির দেড়কামরার বাসাবাড়ি থেকে ছেড়ে আসা বজ্রযোগিনী গ্রামে ফিরে যাবে। অল্পবয়স থেকেই ভাগ্য ফেরানোর তাগিদে ছুটতে ছুটতে সেই স্বপ্ন একদিন হারিয়ে গেল। তারপর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে, যখন রিলিফ ফান্ড গড়া হচ্ছে, অশোক টের পায়, এই মহৎ কর্মযজ্ঞেও সে আর নিজেকে একাত্ম করতে পারছে না। চরম আত্মসঙ্কট তাকে আরও বেশি একাকী করে দিয়েছে আজ—

“শেষ রাতের স্বপ্নে সেই ট্রেনটার আসা-যাওয়া আবার কবে বন্ধ হয়ে গেল।”^{১০}

কাটা দেশে অক্ষরের খোঁজ করেছেন বহু বাঙালি ঔপন্যাসিক - ছোটগল্পকার। শেষ অব্দি বড়ো হয়ে উঠেছে এক অনিকেত দেশ এবং আত্মপরিচিতি খোঁজার অসহ আকৃতি। শঙ্খ ঘোষের সেই অমোঘ পঙ্ক্তিই এই অনুসন্ধানকে ধরে রাখে -

“ছন্দ আছে আসা যাওয়ার ছন্দ আছে

আর তা ছাড়া ধ্বংস তো নয় বরং এ যে

সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়

উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নীচে বৃহস্পতি।”^{১১}

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ দেশভাগ*, ২০০৭, অনুষ্টুপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৮৭-৮৮
২. ভাদুড়ী, সতীনাথ, *গণনায়ক, সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, ১৯৯৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১-১২
৩. রায়চৌধুরী, তপন, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তির পরচরিতচর্চা*, ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৯০
৪. দত্ত, নীলিমা, *উদ্বাস্ত কলোনি*, পাল, মধুময় (সম্পাদিত), *দেশভাগ : বিনাশ ও বিনির্মাণ*, ২০১১, গাঙচিল প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৬৫
৫. উদ্ধৃত, সিকদার, অশ্রুকুমার, *ভাঙা বাংলার সাহিত্য*, ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদিত), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ১৯১-২০৮
৬. বাংলা পার্টিশন-সাহিত্যে এই ‘আদর্শায়নে’র ঝোঁক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১-২০৮
৭. ঘোষ, অমরেন্দ্র, *বেআইনি জনতা*, প্রথম প্রকাশ ১৯৫১, নিও র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ, কলকাতা, ২০২৪
৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *নির্বাস*, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪
৯. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, *নিষ্কিন্তিপুত্রের মানুষ*, কলকাতা, ১৯৬৯
১০. রায়, প্রফুল্ল, *সেরা ৫০ টি গল্প*, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮
১১. ঘোষ, শঙ্খ, *উলটোরথ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশার্স, ১৯৮৬, পৃ. ১৪০